বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।
গদ্য# গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পণ্ডিত, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা - কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাঁহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্ত্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

---

* বঙ্গদর্শন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ।

পদ্য সম্বন্ধে ভিন্ন রীতি। আদৌ বাঙ্গালা কাব্যে কথিত ভাষাই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইত–এখনও হইতেছে। বোধ হয়, আজি কালি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা পদ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে : চণ্ডীদাসের গীত এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্য, অথবা কৃত্তিবাসি রামায়ণ এবং বৃত্রসংহার তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা কেবল বাঙ্গালা গদ্য সম্বন্ধেই বর্ত্তে। যাঁহারা সাহিত্যের ফলাফল অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পদ্যাপেক্ষা গদ্য শ্রেষ্ঠ, এবং সভ্যতার উন্নতি পক্ষে পদ্যাপেক্ষা গদ্যই কার্য্যকরী। অতএব পদ্যের রীতি ভিন্ন হইলেও, এই প্রবন্ধের প্রয়োজন কমিল না।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী, এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। এক দল খাঁটি সংস্কৃতবাদী–যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা–তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীদিগের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না–পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন।* আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত, স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্যই তাঁহাকে এ

সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না?–আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল–পত্নী বা পাঁচ জন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি–কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তকনির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি? –বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না?–ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়, এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়–মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

---

*যে, যে গ্রন্থ পড়ে নাই, যাহাতে যাহার বিদ্যা নাই, সেই গ্রন্থে ও সেই বিদ্যাবত্তা দেখান, বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে একটি সংক্রামক রোগের স্বরূপ হইয়াছে। যিনি একছত্র সংস্কৃত কখন পড়েন নাই, তিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত কবিতা তুলিয়া স্বীয় প্রবন্ধ উজ্জ্বল করিতে চাহেন; যিনি এক বর্ণ ইংরেজি জানেন না, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের বিচার লইয়া হুলস্থূল বাঁধাইয়া দেন। যিনি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ভিন্ন পড়েন নাই-তিনি বড় বড় গ্রন্থ হইতে অসংলগ্ন কোটেশ্যন করিয়া হাড় জ্বালান। এ সকল নিতান্ত কুরুচির ফল।

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতা পুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা পুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, "হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে" এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া"। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে

উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেন না, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এি যে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতা পুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে এক দল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না | পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য | বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা– একাদশ বা চত্বারিংশৎ বা দুই শত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না | ভাই, কাল, কান, সোণা, কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলিন সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তাহা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা–গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা–জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে, যথা–মাথার পরিবর্ত্তে, মস্তক, বামনের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত, ব্রাহ্মণ সেইরূপ প্রচলিত। পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষ আছে যে, ধান্য পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতকগুলি এমত শব্দ আছে যে, তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি", কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই "খেউরি" শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে-তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথার শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্ত্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্ত্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্ত্তে পত্র এবং তামার পরিবর্ত্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে, "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমরা ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমরা ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব", "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, ভাই ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ আনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান্ ইংরেজের অর্থভাণ্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ। তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে শব্দ কর্জ্জ করিতে হইবে। কর্জ্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? "মাধ্যাকর্ষণ" বলিলে কতক অর্থ অনেক অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। "গ্র্যাবিটেশন্" বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য ? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্য কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য–অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য–তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাণ্ডার হইতে দূর রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব এত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত-ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে,

তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না। তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ, কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।
অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য–সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই–নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে–যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে–তজ্জন্য ইংরেজি ফার্সি, আর্‌বি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট করিবে–কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে–লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল

প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।
ইহা আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

লেখক পরিচিতি:

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবর্তনের প্রাণপুরুষ এবং বাঙালির চিন্তার-মুক্তিধারার অন্যতম প্রধান রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম: কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগনা, ১৮৩৮; মৃত্যু: ১৮৯৪)। সমগ্র বাংলাসাহিত্য-পরিসরে তার মতো পরিপূর্ণ সাহিত্যশিল্পী খুব বেশি আবির্ভূত হয়নি।
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা প্রবর্তনের প্রাণপুরুষ এবং বাঙালির চিন্তার-মুক্তিধারার অন্যতম প্রধান রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম: কাঁঠালপাড়া, চব্বিশ পরগনা, ১৮৩৮; মৃত্যু: ১৮৯৪)। সমগ্র বাংলাসাহিত্য-পরিসরে তার মতো পরিপূর্ণ সাহিত্যশিল্পী খুব বেশি আবির্ভূত হয়নি। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, গল্পকার, দার্শনিক, সমালোচক, সমাজ-নেতা, দেশপ্রেমিক, রাষ্ট্রচিন্তক এবং আধুনিক হিন্দুধর্মের একজন মুখ্য ব্যাখ্যা-প্রদানকারী ব্যক্তিত্ব। এই বিশেষ যুগ-প্রবর্তনকারী শিল্প-স্রষ্টার গদ্যনির্মাণের বিশেষত্ব আমাদের অভিনিবেশ আকর্ষণ করে। তার উপন্যাসের গদ্য ধ্বনিসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাসুলভ, উপমা-প্রয়োগে কবিত্বপূর্ণ এবং অনেক বেশি ডেসক্রিপটিভ বা বর্ণনাধর্মী। আখ্যানসমূহে নারীর সৌন্দর্য-বর্ণনা, প্রেম-দাম্পত্য অঙ্কনে তার সাফল্য অবশ্য-আলোচ্য। রোমান্টিকতা-রূপায়নেও তার সাফল্য অনেক। আর তিনি প্রবন্ধের গদ্যে ভাষার গাম্ভীর্য কিংবা প্রতিবেশের রহস্যময়তা সৃষ্টির চেয়ে যুক্তির প্রতি অধিক নিষ্ঠাবান। সরল -বোধগম্য ভাষায় রচিত কিছুটা ভাষণসুলভ তার প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা। সহজ কথায় বঙ্কিমের নিবন্ধভাষা দৃঢ়ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। লেখা-লেখক-পাঠক–এই ত্রয়ী ভাবনায় সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যনির্মাতা আনত ও নিমগ্ন ছিলেন। প্রসঙ্গত, নবীন লেখকদের প্রতি দেওয়া তার একটি উপদেশ এখানে তুলে ধরছি: "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"

'হে ভ্রাতঃ' বলার চেয়ে 'ভাই রে' বললে যে সেই ডাকে মন উথলে ওঠে, তা কে না বোঝে? বঙ্কিমও তা বোঝেন। তবে, 'ভ্রাতৃভাব' না বলে 'ভাইভাব' এবং 'ভ্রাতৃত্ব' স্থলে 'ভাইগিরি' বললে অবশ্যই ভালো শোনায় না! অর্থাৎ, বাংলা শব্দ 'ভাই' বলতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও বিশেষ প্রয়োজনে–ভাষার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় সংস্কৃত শব্দ 'ভ্রাতৃ'ও প্রয়োগযোগ্য। মোটকথা, বঙ্কিমের বক্তব্য হলো–অপ্রয়োজনে বাংলাভাষার শব্দের স্থলে যেমন ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ করা ঠিক হবে

না, তেমনই প্রয়োজনে–ভাষার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অপর ভাষা থেকে শব্দ ধার নেওয়া যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে সূচনা হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) হাতে, সেই প্রারম্ভের সৃজন-নায়কত্ব সময়ের প্রবাহে ও সমাজের প্রয়োজনে একদিন চলে এসেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-প্রকাশের দরোজায়। চিন্তানায়ক বঙ্কিম মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম স্নাতক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আইনশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন কিছুকাল। শিক্ষার্থীজীবন সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের (১৮৬০-১৯০৮) জবানিতে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণীয়:
"আমি আপন চেষ্টায় যা-কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোনো শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলি কলেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে। ক্লাসে কখনো থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশোনা কখনো ভালো লাগিত না–বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশি হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর-একটু বেশি, কাজেই তার কাছে শিক্ষা কিছু হয়নি, নীতিশিক্ষা কখনো হয়নি।"

১৮৫৮ সালে বঙ্কিম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৮৫২ সালে বঙ্কিমের প্রথম রচনা–'পদ্য' নামক কবিতা ছাপা হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস (বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল উপন্যাসও বটে) 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়; আর ১৮৭৪ সালে বোরোয় প্রথম গদ্যরচনা 'লোকরহস্য'। আজকের নিবন্ধে বিদগ্ধ-সাহিত্যশিল্পী সৃষ্টিশীল ও মননজীবী বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা: (লিখিবার ভাষা)' প্রবন্ধের প্রতি আমাদের পর্যবেক্ষণ প্রসারিত থাকবে।

বিশ্লেষণ:
"প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে-সকল বাঙ্গালি ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লন্ডনী কক্নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারে না, এবং এতদ্দেশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালির সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে-ইংরেজরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধহয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।"

লেখার ভাষা কেমন হওয়া চাই–এমন ধারণা নিয়ে নিবন্ধ লিখতে গিয়ে বঙ্কিম এভাবেই শুরু করেছেন তার বক্তব্য। 'বাঙ্গালা ভাষা' নিবন্ধটিতে তিনি বাংলা ভাষার কথিত রীতি বা প্রচলিত

রীতির সাহিত্যিক প্রাসঙ্গিকতা পরিবেশন করতে চেয়েছেন। আর যুক্তি প্রদান করতে গিয়ে নানান বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ইংরেজি-জানা বাঙালি পণ্ডিতেরা যে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করেছেন, অন্তত বাংলা-না-জানাকে গৌরবের মনে করতেন, সে-কথা বলতেও ছাড়েননি বঙ্কিম তার বর্তমান নিবন্ধে। আমরা জানি, বাংলাভাষার বিকাশপর্বে সংস্কৃতের বিরাট-ব্যাপক প্রভাব ছিল। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কথাবার্তায় এবং আলোচনায় সংস্কৃতমিশ্রিত বাংলা বলতে পছন্দ করতেন। তারা এই ধরনের মানসিকতার জন্য আভিজাত্যও বোধ করতেন। এবং সংস্কৃতনির্ভরতা ও অতিমাত্রায় ইংরেজিপ্রিয়তার কারণে বাংলাভাষা তখন নিরস ও দুর্বল ছিল। সত্যিকার অর্থে বাংলাভাষা তার নিজস্ব চেহারায় সে-সময়ে প্রকাশ ও বিকাশ লাভ করতে পারেনি। বঙ্কিম আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন ওই নিরসতা ও দুর্বলতা দূর হোক।

সমকালে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাশীলতা এবং সাধনা বাংলাভাষার উন্নতিকল্পে বিশেষ অবদান রেখেছিল। উত্তরকালেও তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। কঠিন-দুর্বোধ্য ভাষাপ্রিয়তাকে পরিহার করে, তিনি সহজ ও সর্বজনের কাছে পরিচিত তথা চলিত বাংলা প্রবর্তনের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন। এবং তিনি লক্ষ্যও করেছিলেন যে, সমকালীন শিক্ষিত-ভদ্র সম্প্রদায় বাংলাভাষার প্রকৃত প্রয়োগে আগ্রহী। তাই তিনি বললেন: "যে-ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালিতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা–তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য।" রঙ্গ-ব্যঙ্গময় ভাষা নাকি পণ্ডিতি ভাষা–কোনটি পাঠকের কাছে, লেখকের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং সমালোচনা প্রভৃতির ভাষা কী হওয়া প্রয়োজন, সে-বিষয়েও তার অভিমত অত্যন্ত পরিষ্কার। তার মতে, "আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে পারা যায় না, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ।" আবার ভাষাকে কেবল সহজ করার চিন্তায় তাকে অযথা 'ধনশূন্য' করতেও তিনি রাজি নন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃত বা ইংরেজি শব্দ, যা বাঙালির কাছে বোধগম্য, সে -সব লিখতে বা প্রকাশ করতে তিনি কোনো আপত্তি করেননি। যেমন বলছেন: "এ বাঙ্গালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না! যদি সকলে বুঝে, তবে কী দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ?" তবে শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র এবং বর্ণনার সরলতার প্রতি তিনি মনোযোগ স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। যেখানে সহজ বাংলা রয়েছে, সেখানে বিনা দরকারে কঠিন শব্দ প্রয়োগের পক্ষে নন বঙ্কিম। তিনি জানেন এবং মানেন, "অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে।"

'হে ভ্রাতঃ' বলার চেয়ে 'ভাই রে' বললে যে সেই ডাকে মন উথলে ওঠে, তা কে না বোঝে?

বঙ্কিমও তা বোঝেন। তবে, 'ভ্রাতৃভাব' না বলে 'ভাইভাব' এবং 'ভ্রাতৃত্ব' স্থলে 'ভাইগিরি' বললে অবশ্যই ভালো শোনায় না! অর্থাৎ, বাংলা শব্দ 'ভাই' বলতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেও বিশেষ প্রয়োজনে–ভাষার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় সংস্কৃত শব্দ 'ভ্রাতৃ'ও প্রয়োগযোগ্য। মোটকথা, বঙ্কিমের বক্তব্য হলো–অপ্রয়োজনে বাংলাভাষার শব্দের স্থলে যেমন ভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ করা ঠিক হবে না, তেমনই প্রয়োজনে–ভাষার সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য অপর ভাষা থেকে শব্দ ধার নেওয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত, মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর সকল অগ্রগামী ও জীবিত ভাষাই অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। প্রাতিস্বিক ঐতিহ্য-সম্ভার ও সামর্থ্য মূল কথা; আর বাইরে থেকে আমদানি করা শব্দে ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হলো পারদর্শিতার পরিচায়ক। সফলভাবে ভিন্নভাষার শব্দ প্রয়োগেও থাকতে হয় বিশেষ যোগ্যতা। তবে, মুখে বলার ভাষা আর লিখবার ভাষা অবশ্যই আলাদা হবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন:

"যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথন এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন।" এবং "বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন–সরলতা এবং স্পষ্টতা।... বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে–যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে–তজ্জন্য ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে-ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে–কেননা যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প।"

বাংলাসাহিত্যের বিকাশপর্বে ভাষা-প্রয়োগ-বিষয়ক চিন্তার দ্বন্দ্ব চলাকালে সমাজ-বিশ্লেষক, সাহিত্যের অনন্য সাধক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এমন সময়োপযোগী নিবন্ধ আমাদের জাতীয়তা ও ভাষার নিজস্বতা রক্ষায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। কেবল লিখে নয়, কিভাবে লিখতে হবে, কার জন্য লিখতে হবে–লেখার শক্তি-সৌন্দর্য-সামর্থ্য কেমন হওয়া চাই–এসব বিষয়েও ভেবেছেন, ভাবনার প্রকাশ করেছেন 'সাহিত্যসম্রাট' বঙ্কিম!

মোঃ রায়হান খান
কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ raihan.khan01@northsouth.edu